জন্মান্তর

বিমল বললো, "রেখে দে তোর জন্মান্তরবাদ। যত্তো সব গুল। একই আত্মা নাকি দেহ পাল্টে আসছে ঘুরে ফিরে। কখনো মানুষ, কখনো রামছাগল, কখনো বা জলহস্তী হয়ে। গাঁজা, স্রেফ গাঁজা।"

দত্ত চটে যায়, "তোমাদের নিরেট স্থূল বুদ্ধিতে বোধগম্য না হলেই সেটা গাঁজা বলে নস্যাৎ করতে চাও তোমরা। এত বড় বড় মহাপুরুষদের বাণী কি সব মিথ্যে? সক্রেটিস পর্যন্ত জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতেন তা জানো?"

সনৎ বললো, "তা না হয় মানলাম, কিন্তু কয়েকটা প্র্যাক্টিক্যাল অসুবিধে থেকে যাচ্ছে যে ! যেমন ধরো এই যে পৃথিবীর জনসংখ্যা ধাঁ-ধাঁ করে বেড়ে চলেছে - এই বাড়তি আত্মাগুলো আসছে কোত্থেকে? তাছাড়া ---- "

কিশোরীদা ততক্ষণে ছাতাটি সযত্নে বন্ধ করে বারান্দার এক কোণে সেটিকে দাঁড় করিয়ে ঘরে ঢুকেছেন। ওঁকে দেখে সবাই সোল্লাসে কলরব করে উঠলো।

কিশোরীদা চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি নিয়ে তর্কটা হচ্ছে?"

বরুণ বিরক্তির সুরে বললো, "আর বলেন কেন। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই বাবুরা গেলেন স্বামী রুদ্রানন্দজীর আধ্যাত্মিক ভাষণ শুনতে। এখন ধর্মকথা শুনতে শুনতে প্রাণ যাচ্ছে আমাদের।"

সুরজিৎ প্রশ্ন করে, "আচ্ছা কিশোরীদা, আপনি জন্মান্তর মানেন না?"

কিশোরীদা গম্ভীর মুখে বললেন, "দ্যাখো বাপু, এটা হল বিশেষজ্ঞদের যুগ। ও সব আত্মা-টাত্মার ব্যাপারেও বিশেষজ্ঞ রয়েছে প্রচুর। আমার মত সাধারণ মানুষের এসব ব্যাপারে নাক গলিয়ে কাজ কি? আজকের বাজারে তাদেরও তো করে খেতে হবে?"

বিমল বললো, "আত্মা-টাত্মা স্রেফ ভাঁওতা। একটা লোক মরে গেল। আত্মীয় স্বজন তাকে দাহ করে এসে ঘটা করে শ্রাদ্ধ করলো। কিছুকাল পরে তার আত্মাটা হরিণের দেহ ধরে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, গলা বাড়িয়ে গাছের কচি পাতার গোছায় টান মারছে, এ সব কথা বিশ্বাস করেন আপনি?"

কিশোরীদা বললেন, "জন্মান্তরের জন্যে মরার দরকার পড়ে না। একই দেহ নিয়ে একই জীবনে কতবার যে জন্মান্তর ঘটে মানুষের! তারকমামার জীবনের অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছি তোমাদের। আমার মায়ের আপন পিসতুতো ভাই। একেবারে ব্যক্তিগত ঘটনা এসব।"

বরুণ বললো, "দোহাই কিশোরীদা, এমন সন্ধ্যেটা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা শুনিয়ে মাটি করবেন না। একটা ভূতের গল্প ছাড়ুন বরং।"

বিমল বললো, "ভূতের নয়। প্রেমের।"

দত্ত বললো, "না, না, বাদলার দিনে ভূতই জমবে ভাল।"

বিমল প্রতিবাদ করে, "কেন, প্রেমও তো বৃষ্টি বাদলের দিনেই ভাল জমে থাকে।"

কিশোরীদা বললেন, "শোন বাপু, ভূত আর প্রেম দু'য়েরই জাত এক। যার ঘাড়ে ভর করে সেই শুধু এর মর্ম বোঝে। দু'টোই বিশ্বাসের ব্যাপার। যদি ভাবো আছে তাহ'লে আছে, আর যদি ভাবো নেই তবে নেই।" একটা হাত ঊর্ধ্বে তুলে বার দুই তুড়ি মেরে আবার বললেন, "দুটোই এই আছে, এই নেই। ---- যাক যে কথা বলছিলাম। তারকমামার কাহিনীর সূত্রপাত আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানতাম না। গেল বার কলকাতায় গিয়ে আদ্যোপান্ত শুনলাম। খোদ তারকমামার মুখ থেকে। তার জবানীতেই শোন গল্পটা, একেবারে উত্তমপুরুষে। তাতে গল্প জমবে ভাল। নইলে 'মামা অমুক করলো', 'মামা তমুক করলো' করে গল্পের অ্যাট্‌মোস্‌ফেয়ার্‌টাই মাটি হয়ে যাবে।"

(২)

যখনকার কথা বলছি তখন সুলতানপুরে অধিকাংশ বাড়িতেই লণ্ঠন

জ্বলতো, তখনো বিজলি বাতির চল হয়নি তেমন। সবসুদ্ধু আট দশটি বাঙালী পরিবার বাস করতো। আর্থিক অবস্থার অমিল সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল। একের বিপদে অন্যেরা বুক দিয়ে সাহায্য করতো। কাজে-কর্মে, পুজো-পার্বণে জোট বেঁধে নামতো সবাই।

আমরা ছোটরাও দল বেঁধে থাকি। এক সঙ্গে স্কুলে যাই। বিকেল বেলা এক সঙ্গে খেলি। কোনদিন এবাড়ির উঠোনে, কোনদিন ওবাড়ির ছাদে। বাড়ির গিন্নীরা যেদিন যা ঘরে থাকে আমাদের হাতে দেন - কুচো নিমকি, মোয়া, গজা কিংবা মুড়ি মাখা। অথবা কোন ফল। আমাদের মনে উচ্চ-নীচ বড়লোক-গরীব আপন-পরের বোধ জাগেনি তখনও। চৌধুরীদের মেয়ে টুনু অম্লান বদনে আমার কামড় দেওয়া ডাঁসা পেয়ারার ভাগ চাইতো যদিও চৌধুরীমশাই সুলতানপুরের গণ্যমান্য, পসারওলা ডাক্তার এবং টুনু তাঁদের একমাত্র সন্তান। বিহিটা, কৈলোয়ার এমন কি সাসারাম থেকেও ট্রেনে করে রুগী আসতো চৌধুরীমশায়ের কাছে। আর আমার বাবা ছিলেন ছোটলাইনের সামান্য এক টিকিট চেকার। সুলতানপুরে ছোট্ট একফালি জমি কিনে চালাঘর তুলেছিলেন বাবা। যাতে ওঁর ঘন ঘন বদলির দরুন মা এবং আমাদের ক'ভাই-বোনকে জায়গা বদল করতে না হয় বারে বারে।

সুলতানপুরের স্কুলে তখন মাত্র ক্লাস সেভেন অবধি ছিল। সেভেন পাশ করার পর বাবা আমাকে আরা পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে আমার বড় মামা থাকতেন। গরমের ছুটি আর পুজোর ছুটিতে সুলতানপুরে যাই। আরাও এমন কিছু হিল্লি-দিল্লী নয়, তবু খাঁটি শহর। সুলতানপুরের ছেলেমেয়েরা সমীহের চোখে দেখে আমায়। লম্বা লম্বা গল্প ছাড়ি আর ওরা অবাক বিস্ময়ে শুনে যায়। চৌধুরীদের মেয়ে টুনু ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে তখন। আগেকার মত হুটোপাটি খেলায় আর যোগ দেয় না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'চোখে মধুর প্রহেলিকার ঝিকিমিকি নিয়ে। ওকে দেখলেই আমার বুকের মাঝে একটা অস্থিরতা অনুভব করি। আরায় ফিরে গিয়েও প্রায়ই ঘুরে ফিরে টুনুর কথা মনে পড়ে আর এক আশ্চর্য মাদকতায় দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ধীর মন্থর গতিতে বছরগুলো আসে আর যায়। বয়ঃসন্ধিকালের আধো আলো আধো ছায়া ঘেরা আশা আকাঙ্খাগুলো সাকার হয় ক্রমে।

স্কুলের গণ্ডী ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি তখন। পাটনায় থাকি। হস্টেলে। বৎসরান্তে একবার সুলতানপুরে যাই। শুধু পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছেই নয়, নিজের বাড়িতেও অভ্যাগতের খাতির যত্ন পাই সে ক'দিন।

টুনু প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবার জন্যে তৈরী হ'চ্ছে। অবশ্য প্রস্তুতিটা মুখ্যত সময় কাটানোর উপকরণ। ও যে পাশ করবে সে আশা যেমন পোষণ করে না কেউ, তেমনি ওর পাশ করার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করে না। চৌধুরী মশায়ের পসার ততদিনে আরও বেড়েছে। এত বছর ধরে যা টাকা জমিয়েছেন তাতে ফেলে ছেড়েও দিব্যি আরামে কেটে যাবে টুনুর। তাছাড়া ভাল ঘর-বরও জুটবে নিশ্চয়ই।

এইখানে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাভিক্ষু আমি। কপালক্রমে পাল্‌টি ঘর যদিও, ঘর হিসেবে উঁচুগলা করে বলার মত কিছুই নেই। তবু, মিড্‌ল স্কুল থেকে বরাবর স্কলারশিপ পেয়ে এসেছি। ম্যাট্রিকে প্রথম দশজনের মধ্যে স্ট্যাণ্ড করেছি। আই.এ.-তে একেবারে প্রথম। ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে বি.এ. পড়ছি। ফার্স্টক্লাস যে পাবোই সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। শুধু অনার্সে নয়, এম.এ.-তেও। তারপর কোন একটা ভাল কলেজে অধ্যাপকের চাকরি রোখে কে? কাজেই পাত্র হিসেবে খুব একটা ফ্যাল্‌না হবো না নিশ্চয়ই। টুনুও সেই ভরসাই দিয়ে আসছে। ইদানীং ওর বাবা-মা'র ব্যবহারেও প্রশ্রয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। তা না'হলে তাদের কিশোরী কন্যার পড়া বোঝানোর ভার আমায় দেবে কেন? ছুটির ক'টা দিন দু'জনে যাতে একটু কাছে কাছে কাটাতে পারি তারই সুবিধা করে দেওয়া বই তো নয় !

সেবার পাটনায় ছাত্র আন্দোলনের দরুন বেশ কিছুদিন পড়াশোনা বন্ধ রইলো। হবি তো হ সেই বছরেই বন্যায় রেললাইন-টাইন সব জলে ডুবে থৈ থৈ কাণ্ড। মোট কথা সেবছরের ছুটিটা মাঠে মারা গেল আমার। সুলতানপুর যাওয়ার বদলে পাটনায় হস্টেলে বই মুখে করে কাটাতে হল। তার পরের বার ফাইনাল।

বাবা লিখলেন, "পরীক্ষা সামনে। এবার ছুটিতে বাড়ি আসার দরকার নাই। তাহাতে পড়াশোনার ক্ষতি হইতে পারে। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর তোমার ভবিষ্য ৎনির্ভর করিতেছে ----।"

বাবার কথায় যুক্তি ছিল। আমি বাড়ির বড় ছেলে। আমাকে যে এতদিনে কোন একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেননি তা শুধু আমার পড়াশোনায় আগ্রহ এবং পরপর সবকটা পরীক্ষায় এত ভাল রেজাল্ট দেখে। বাবা আমার ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নষ্ট করে দিতে চান নি। এর জন্যে তাঁদের যে কি পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে সেকথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেননি পাছে আমি মনে দুঃখ পাই, আমার পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে।

টুনু ও আমার মধ্যে মন বোঝাবুঝি বহুদিন আগেই হয়ে গেলেও চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিল না। তখনকার কালটাই অন্যরকম ছিল। তবে টুনু চিঠি না লিখলেও বাড়ির চিঠিতে সুলতানপুর সম্বন্ধে খবর থাকতো। সেটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হত আমায়। সামান্য খবরগুলোই আমার কল্পনার উত্তাপে অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে ডালপালায় পল্লবিত হ'ত। মা যদি লিখতেন, "এখানে ভীষণ গরম পড়িয়াছে ----," কল্পনার চক্ষে দেখতাম টুনু হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে, ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে পাতলা ভয়েলের ব্লাউজ। আবার যদি বাড়ির চিঠি পেতাম, "এ বছর প্রচণ্ড শীতে সকলে কাহিল।" মানস চক্ষে টুনুর শুকনো মুখখানা ভেসে উঠতো। দু'দিনের বাসি বিনুনি, কপালের পাশে রুক্ষ চূর্ণ কুন্তল। মুখে রুমাল চেপে ধরে একটানা কেশে চলেছে খক্ খক্ খক্ ----।

বাড়ির চিঠিতেই জানলাম স্বামী কর্পূর মহারাজের সুলতানপুরে পদার্পণের কথা। ক্রমশ চিঠিগুলো তাঁরই লীলাকীর্তনে ঠাসবোঝাই হতে লাগলো পারিবারিক কুশল প্রশ্ন খবরাদি উৎখাত করে। এরপর শুনলাম মহারাজ নাকি সেবক সমেত চৌধুরী বাড়িতে এসে উঠেছেন। চৌধুরীমশাই সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়েছেন। এর কিছুকাল পরে খবর পেলাম গুরুদেবের সেবা উপাসনায় বিঘ্ন হওয়ায় ডাক্তারী ছেড়ে দিয়েছেন উনি এবং একাগ্র চিত্তে গুরুসেবাতেই নিয়োজিত করেছেন নিজেকে।

এরপর চিঠিপত্রে ও সম্পর্কে উল্লেখমাত্র থাকতো না আর। আমি দু'একবার মহারাজের লীলাখেলা সম্বন্ধে কৌতুহল প্রকাশ করে হতাশ হ'লাম। পত্রোত্তরে সে কথার উচ্চ-বাচ্যও করতো না কেউ। কর্পূর মহারাজ হঠাৎ কর্পূরের মতই উবে গেলেন।

সে বছর পরীক্ষা পিছিয়ে গেল। জুন মাসে আরম্ভ হবে। মার্চ মাসে পাঁচ দিন হোলির ছুটি। হঠাৎ মনস্থির করে একটা ব্যাগে সামান্য জিনিসপত্র ভরে নিয়ে সুলতানপুরের ট্রেনে চড়ে বসলাম। সকাল ন'টা নাগাদ পৌঁছে গেলাম।

মার্চ মাস পড়ে গেলেও বাতাসে তখনো শীতের আমেজ। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে সবে হাঁটতে শুরু করেছি এমন সময় আমার নাম ধরে ডাকলো কেউ। পিছন ফিরে দেখি সুলেমান। হালুয়াই-এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে জিলিপি খাচ্ছে। ক্লাস সেভেন অবধি একসঙ্গে পড়েছি আমরা। শুনলাম ও আজকাল বাপের দর্জির দোকানে কাজ শিখছে।

জিলিপির ঠোঙাটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "খা।"

সুলতানপুরের খবর জিজ্ঞেস করলাম। জানার মত খবর আমার একটাই, যে জন্যে পাটনা থেকে হাঁকু-পাঁকু করতে করতে ছুটে আসা। সুলেমানকে কায়দা করে বিষয়বস্তুটা একবার ধরিয়ে দিতেই ও হুড় হুড় করে বলে চললো। রাস্তার পাশে একফালি ঘেসো জমি। সেখানেই বসে পড়লাম। আধখাওয়া জিলিপি খসে পড়লো হাত থেকে।

সুলেমান বললো, "ডাগডর সাব তো বিলকুল সাধু বন্ গিয়া। মরিজ্ ওরিজ্ দেখনা ছোড় দিয়া। দিনভর পূজাপাঠ করতে হ্যাঁয়। আপনি বেটি কি শাদি ভি কিষণ ভগওয়ান সে কর দিয়া।"

কর্পূর মহারাজের নাকি একটা সোনার শ্রীকৃষ্ণ আছে। তারই সঙ্গে টুনুর বিয়ে হয়ে গেছে। অগ্নিসাক্ষী করে, একেবারে বৈদিক মতে। চৌধুরীমশায় বিয়েতে মেয়ে জামাইকে দেওয়া থোওয়া করেছেন প্রচুর। গাঁসুদ্ধু লোক চারদিন ধরে পাত পেড়ে নেমন্তন্ন খেয়েছে, সেই গায়ে হলুদের দিন থেকে বৌভাত অবধি।

খানিক বাদে সুলেমান বললো, "চল্ উঠি এবার।"

আমার তখন সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেছে। বললাম, "তুই যা, আমি একটু পরে যাবো।"

সুলেমান সহানুভূতিভরা চোখে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ।

তারপর বললো, "আমি যাই রে। আব্বাজান আমার জান খাবে দেরী করলে।"

সুলেমান চলে গেল। আমি সেই একই ভাবে বসে রইলাম। কতক্ষণ কে জানে। চোখের সামনে সিনেমার পর্দার মত অতীতের ছবিগুলো পরপর ভেসে উঠতে লাগলো। খালি গা, ইজের পরা টুনু। ন্যাড়া মাথা টুনু। বেড়াবিনুনি বাঁধা, ফ্রক পরা টুনু। তন্বী যুবতী টুনু।

মানুষের সব আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই খানিকটা আশঙ্কা মিশে থাকে প্রদীপের ছায়ার মত। টুনু যে আমার এবং একদিন আমারই হবে পাকাপাকি ভাবে এই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ওকে হারানোর ভয়ও হয়তো লুকিয়ে ছিল আমার মনের অবচেতনে। কিন্তু ঠিক এরকম কিছু ঘটবে, ঘটতে পারে, তা যে উন্মাদ কল্পনারও বাইরে ! ক্লান্ত পায়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার বিশ্বসংসার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। শুধু একবার শেষবারের মত যাচাই করে নেওয়া বাকী ----।

চৌধুরীবাড়িতে উৎসবের রেশ পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি তখনো। গেটে শুকনো কলাগাছে লাল-নীল কাগজের মালা। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে মাটি ছুঁয়ে আছে। বাড়ির আনাচে কানাচে নানা আকৃতির জাপানী কাগজের ফুল ঝুলছে। বাড়ির পিছন দিকে দেয়াল ঘেঁষে এঁটো শালপাতা ও মাটির খুরি-গেলাসের স্তূপ। সেগুলো মোষের গাড়িতে তুলছে সাফাইওলা। ভিতর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। চারিদিকে অচেনা আধচেনা মুখ, ব্যস্ত সবাই। এরই মাঝে হঠাৎ বাড়ির পুরোনো ঝি শনিচরিকে দেখলাম। এক গামলা জল হাতে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কাকে কি বলছে।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম, "টুনু কোথায়?"

"দিদিজী উপর বানি।"

ওর পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম।

দোতলায় একটা বন্ধ দরজার কাছে এসে থামলো শনিচরি, "দিদিজী, গরম পানী লাইল বানি।"

"ভিতরে আয়।"

শনিচরি পা দিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। পিছনে আমি। টুনু ব্যস্ত হাতে কিছু একটা জিনিস তোয়ালে চাপা দিলো।

তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললো, "এই যে, এসো। কবে এলে?"

শনিচরি উপুড় হয়ে গামলাটা মাটিতে রাখলো। তারপর বললো, "আউর কোই কাম বা তো বোলিঁ ----।"

টুনু আদুরে গলায় বললো, "দ্যাখো না, কিছুতেই তেল মাখতে চাইছে না। এই ঠাণ্ডায় তেল না মাখলে গা ফাটবে না? কাকে বোঝাবো! গোয়ালাদের সঙ্গে থেকে যত জংলী বদ্ অভ্যেস শিখেছে ----।"

জলচৌকির উপর টার্কিশ তোয়ালের ফাঁক দিয়ে ঘুঙুর পরা এক জোড়া ধাতব পা বেরিয়ে রয়েছে। ওপাশ থেকে হাতের বাঁশিটাও দেখা যাচ্ছে খানিকটা। মেঝেতে স্নানের সামগ্রী ছড়ানো। সোপ-কেসে চন্দন সাবান, এক শিশি অলিভ অয়েল, ট্যালকাম পাউডার, চিরুনি, গা-ঘষা। টুনুর দিকে চোখ ফেরালাম। সিঁথিতে সিঁদুর, কপাল জুড়ে বিরাট একটা টিপ। গা ভরা গয়না। আঁচলের খুঁটটা আলগোছে মাথার উপর টেনে দিয়েছে। পাশ দিয়ে ভিজে চুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠময়। আমায় তাকাতে দেখে অল্প একটু হাসলো।

তারপর জলচৌকির দিকে দেখিয়ে বললো, "দেখছো তো কি রকম জ্বালাতন করে আমায় ! এবার থেকে কিন্তু শনিচরির হাতেই চান করতে হবে, বলে দিলাম। লাজ লজ্জার তো এমনিতেও বালাই নেই।"

নীরবে ঘরের বাইরে চলে এলাম।

শুনলাম টুনু বলছে, "এই, জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মীটি তেলটা মাখাতে দাও ! পুরুষ মানুষের এত জেদ কি ভাল?"

টুনুদের বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে চললাম। দূরে রেললাইন দেখা যাচ্ছে। ওপাশে পাঁড়েজীদের গোয়ালঘর। মাঝখানে কিছু ঝোপঝাড়। ঝোপের পিছনে ব্যাগটা নামিয়ে বসে পড়লাম। আড়াইটে নাগাদ একটা মেলগাড়ি যায় এ লাইনে। দুপুর হয়ে এসেছে। ঘন্টাদুয়েক এখানেই কাটিয়ে দেবো। তারপর মেলগাড়ি

আসার একটু আগে লাইনের উপর শুয়ে পড়বো। তারপর ঘুম। সে ঘুম আর ভাঙবে না কোনদিন।

ব্যাগটা টুনুদের বাড়ি রেখে এলে হত। জিনিসগুলো খোয়া যেতো না। ওরা পাঠিয়ে দিতো বাড়িতে। অবশ্য একটা অসুবিধে ছিল তাতে। ওরা যদি এক্ষুনি পাঠাতো, মেলগাড়ি আসার আগেই, তবে আমার এখানে আসার সংবাদটা চাউর হয়ে যেতো। আমার খোঁজে বেড়িয়ে পড়তো ভাই বোনগুলো। ভাইবোন। তিন বোন আর দুই ভাই। আমায় নিয়ে ছ'জন। অন্য ভাই দুটো - নেপাল আর গোপাল, ওদের তেমন মাথা নেই। বড় বোন গীতুটা মেধাবী ছিল। কিন্তু গরীব ঘরের মেয়ে মেধা নিয়ে করবে কি? তার বদলে রংটা যদি ফর্সা হত কাজের কাজ হত বরং। বিয়ের বাজারে সহজে পার করা যেতো। আমার থেকে তিন বছরের ছোট। সতেরো পার হয়ে গেছে। এতদিনে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা। বাবা পেরে ওঠেননি। বিহারে বাঙালী পাত্র বিরল, যে দু'একজনের খোঁজ পাওয়া গেছিল তাদের খাঁই মেটাবার সাধ্য তাঁর ছিল না। অবশ্য কোলকাতা টোলকাতার দিকে চেষ্টাচরিত্র করলে অ্যাদ্দিনে উতরে যেতো, রংটা চাপা হলেও দেখতে মন্দ নয় গীতু। কিন্তু বাবা ওসব দিকে যেতে চান না।

কিছু বললে বলেন, "সবুর করো, তারকটা দাঁড়িয়ে যাক। এমন দশা কি আমাদের চিরটা কাল থাকবে ভেবেছো? সব হবে, দু'টো বছর সবুর করো শুধু।"

নাঃ, ওসব কথা ভাববো না। কোন কথা ভাববো না। নেপাল, গোপাল, গীতু, মিঠু, বুলু। মা বাবার কথাও ভাববো না। এমন কি টুনুর কথাও না। সব ভাবনাচিন্তার ইতি হয়ে গেছে। এখন শুধু চরম পরিসমাপ্তির প্রতীক্ষা ----।

বেশ কিছুটা সময় কেটে গেছে। তন্দ্রা নয়, এক অবসন্নতা ঘিরে ধরেছে আমায়। ঘড়ি নেই, মাঠে রোদের খেলা দেখে হিসেব রাখছি সময়ের। ট্রেনের আওয়াজের জন্যে কান পেতে রয়েছি, হঠাৎ কানে একটা আওয়াজ এলো। আমার একেবারে কাছে, ঝোপের ওপাশ থেকে এসেছে আওয়াজটা। ঘাড় বেঁকিয়ে দেখি একটা মেয়েলোক এসে দাঁড়িয়েছে। মুখটা এখান থেকে ভাল করে দেখা যায় না। কেমন যেন

সাবধানী, সতর্ক হাবভাব। বারে বারে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছে।

হঠাৎ তড়িৎ স্পৃষ্টের মত উঠে বসলাম। এতো গীতু, আমার বোন! তবে কি পঞ্চশরের বাণবিদ্ধ আমাদের পরিবারে আমি একা নই? বাবা মেয়ের বিয়ের চেষ্টায় ঢিলে দিয়ে বসে রয়েছেন আমার উপার্জনশীল হওয়ার প্রতীক্ষায়। মেয়ে কিন্তু বসে নেই। নিজেই বেরিয়ে পড়েছে গোপন অভিসারে। চড়াৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কিন্তু না, শেষ অবধি দেখবো। বংশে চুনকালি দিয়ে বেহায়া মেয়েটা কদ্দূর এগিয়েছে, এবং সে হতভাগাটাই বা কে জানতে হবে। ঘাপটি মেরে বসে রইলাম শিকারী বিড়ালের মত। চরম মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে না হোক, ঝুঁটি ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনবো। তারপর ----। হাত নিসপিস করে উঠলো। দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলাম নিঃশব্দে।

গীতু এদিক ওদিক তাকিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। পাঁড়েজীর গোয়ালঘরের চালের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে হাত বাড়ালো। পট্ করে একটা ঝিঙে ছিঁড়লো। তারপর আর একটা। আরও একটা ----।

ইংরিজীতে মোমেন্ট অফ ট্রুথ বলে একটা কথা আছে। সেই মুহূর্তটা আমার মোমেন্ট অফ ট্রুথ। বিরাট ঝাঁকানি দিয়ে কেউ যেন আমাকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে টেনে তুললো, আত্মার চোখেমুখে হিমশীতল বাস্তবের জলঝাপ্টা মেরে। গীতু যাওয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়ালাম। মেলগাড়ি খানিক আগে চলে গেছে। বাড়ির পথ ধরলাম। আমার অপ্রত্যাশিত আগমনে কলরব করে উঠলো সবাই। বললাম দিন পনেরো ধরে বাড়ির চিঠি পাইনি। তার উপর কাল ভোররাত্রে বিচ্ছিরি একটা স্বপ্ন দেখেছি। আজ রাত্রেই ফিরে যাবো আবার। পরীক্ষা সামনে, পড়ার চাপে সময় নেই মোটে। মা সামনে বসিয়ে ঝিঙের ঝোল আর ভাত খাওয়ালো যত্ন করে। আর পুদিনা-কাঁচালঙ্কা বেটে চাটনি।

বিকেলে বাড়ির পিছনে চারপাইয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছি চোখ বুঁজে। গীতু পাশে এসে বসলো।

ডাকলো, "এই দাদা, ঘুমোচ্ছিস্?"

চোখ খুলতে নীচু গলায় বললো, "এখানকার খবর শুনেছিস?"

শুধু শোনা নয় চাক্ষুষ দেখে এসেছি ক'ঘন্টা আগে।

সেকথা চেপে গিয়ে অবাক মুখ করে বললাম, "খবর মানে? কিসের খবর?"

রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মা কাঠের উনোনে সকাল সকাল রুটি বানাচ্ছে, আমি খেয়েদেয়ে ট্রেন ধরতে যাবো।

ঘাড় বেঁকিয়ে সেইদিকে একবার দেখে নিয়ে গীতু বললো, "চৌধুরীমশায়কে সন্ন্যেসীরা গুণ করেছে। সোনার কেষ্টর সঙ্গে টুনুর বিয়ে দিয়েছে। সে কি ধূমধাম বিয়েতে ! কর্পূর মহারাজ বরকর্তা, কেষ্ট এখন ঘর জামাই। কর্পূর মহারাজ তার চেলাচামুন্ডাদের নিয়ে রাজত্ব করছে। চৌধুরীমশাই সারাদিন ঠাকুরঘরে ভোম্ হয়ে পড়ে থাকে। সবাই নানা কথা বলে। মহারাজ নাকি ওঁকে কিসব নেশা ধরিয়ে দিয়ে একেবারে হাতের মুঠোয় করে নিয়েছে। বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে ওঁর। এখানকার বাঙালীরা কেউ আর ওবাড়ি যায় না। প্রথম প্রথম টুনুর জন্যে খুব কষ্ট হত। মাকে লুকিয়ে একবার গেছিলামও। জানিস্ দাদা কি অদ্ভুত বদলে গেছে টুনুটা ! গিয়ে দেখি কোমর বেঁধে ঝগড়া করছে বাপ-মা'র সঙ্গে। রাত্রে নাকি ভোগের লুচি ডালডায় ভাজা হয়েছিল। তাই খেয়ে অম্বল হয়েছে কেষ্টঠাকুরের। তক্ষুনি আবার লোক ছুটলো ঘি আনতে। বড় ক্যানেস্তারা ভর্তি ঘি আর ছ' ডিবে অষ্ট্রেলিয়ান মাখন। আগেরবার দিশী মাখনে কেষ্টঠাকুর নাকি কলাবীচির গন্ধ পেয়েছিল!"

পাটনার অধ্যাপকরা সবাই আমায় স্নেহের চোখে দেখতেন। এঁদের মধ্যে প্রফেসর গুহকে প্রথম থেকেই মনে মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম আমি। আমি আর এম.এ. পড়তে চাই না একথা কোনক্রমে তাঁর কর্ণগোচর হয়। আমায় নিজের ঘরে ডেকে এ কথা সত্যি কি না জানতে চাইলে আমি অকপটে আমাদের সংসারের কথা ওঁকে বলি। প্রথমটায় মনঃক্ষুন্ন হলেও শেষপর্যন্ত আমার সঙ্কল্পের যথার্থতা উনি মেনে নেন এবং ওঁরই পরামর্শমত রেন্‌বো এন্টারপ্রাইজে চাকরির দরখাস্ত পাঠাই। বি.এ. পরীক্ষার দিন দশেক পরেই ইন্টারভিউ হয় এবং চাকরিটা পেয়ে যাই আমি।

ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান বীরেশ্বর দত্ত যে প্রফেসার গুহর নিকট আত্মীয় সেকথা আমি জানতে পারি বেশ কিছুদিন পরে। তবে বীরেশ্বর দত্ত পরে আমাকে বলেছিলেন যে সেদিন প্রফেসার গুহর সুপারিশ না থাকলেও আমাকেই বেছে নিতেন তাঁরা, এবং চাকরিটা আমি নিজের যোগ্যতাবলেই পেয়েছি। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলাম কারণ এর কয়েক বছর পর তাঁর একমাত্র সন্তান সবিতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় এবং প্রস্তাবটা তাঁদের তরফ থেকেই আসে। আমার সম্বন্ধে তাঁদের উচ্চ ধারণার এটা একটা দৃঢ় প্রমাণ নিশ্চয়ই।

কাজের চাপে সুলতানপুরে যাওয়া খুব একটা হয়ে উঠতো না। গেলেও বড়জোর একদিন বা দু'দিনের জন্যে যেতাম। চৌধুরীবাড়ির খবর জানার আগ্রহ থাক বা না থাক কানে আসতোই কিছু কিছু। চৌধুরীমশাই কিছুদিন পরে মারা যান এবং তাঁর মৃত্যুর পর একটি সাংঘাতিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। চৌধুরামশাই নাকি প্রচুর ধারদেনা রেখে গেছেন। বাড়িখানা বন্ধক রেখে মোটা টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। অন্য যা স্থাবর সম্পত্তি ছিল সে সবই হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। বাড়ি বন্ধক রাখার ব্যাপারটা একেবারে গোপনে হয়েছিল। সম্পত্তি বিক্রীর কথাও বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেনি কেউ। এমন কি নিজের স্ত্রীকেও কোন আভাস দেননি চৌধুরীমশাই। অথচ সেই বিরাট টাকার অঙ্ক, যা নাকি বাড়ি বন্ধক দিয়ে ঋণ হিসেবে নিয়েছিলেন, এবং যে টাকাটা এখানে ওখানে জমিজিরেত বেচে পেয়েছিলেন তার কোনও হদিশই পাওয়া গেল না। রাতারাতি পথে বসলো টুনু আর টুনুর মা। কর্পূরমহারাজ চেলাদের নিয়ে কেটে পড়লেন। শাঁসালো যা কিছু আগেই আত্মসাৎ করেছেন, এখন আর ছিবড়ে নিয়ে কালক্ষেপ না করে অন্যত্র নতুন শিকারের অন্বষণে গেলেন।

রিটায়ার করার পর বাবা মা ও ভাইবোনদের নিয়ে আমার কাছে চলে এলেন। গীতুর মোটামুটি ভালই বিয়ে হল। নেপাল-গোপালকে আমাদের কোম্পানিতে কাজ পাইয়ে দিলাম। কয়েক বছর পর মিঠু-বুলুরও বিয়ে হয়ে গেল। বাবা মা আজীবন মুখবুঁজে কত না কষ্ট করে গেছেন সংসারটাকে দাঁড় করাতে। শেষ জীবনে তাঁদের যদি একটু আরাম, সচ্ছলতা, শান্তি ও তৃপ্তি দিতে পেরে থাকি তাতেই আমার জীবনের সার্থকতা ----।

(উপসংহার)

কাহিনীর এই অংশে এসে কিশোরীদা হঠাৎ চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হলেন। নাসারন্ধ্রের ঈষৎ কম্পন ছাড়া কোনও সাড়া নেই আর। বরুণ এক ফাঁকে উঠে গিয়ে বনোয়ারীলালকে নীচু গলায় কিছু নির্দেশ দিয়ে এসেছিল বেশ কিছুক্ষণ আগে। এইবার বনোয়ারীলাল পটভূমিতে প্রবেশ করলো করিমের দোকানের মার্কামারা বিরাট একটা কাগজের মোড়ক হাতে করে।

বরুণ ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে মোড়কটা সংগ্রহ করে ভারিক্কি গলায় বললো, "এইবার চটপট চা বানিয়ে আনো দিকি।"

কিশোরীদা নিস্পৃহ চোখে তাকালেন। প্যাকেটটা খুলে কিশোরীদার সামনে মেলে ধরতেই রুমালিরুটিতে প্যাঁচানো কাবাবগুচ্ছের সুঘ্রাণে মেসবাড়ি আমোদিত হয়ে উঠলো। কিশোরীদা আলগোছে একটা কাবাবরোল তুলে নিলেন। অন্যেরাও হাত লাগালো। মাথা পিছু দু'টো করে রোল। মুনিরাম থাকলে তার জন্যেও বরাদ্দ হত। কিন্তু মুনিরাম ছুটিতে গ্রামে গেছে পাড়াতুতো ভাইপো বনোয়ারীলালের হাতে মেসবাড়ির দায়িত্ব সঁপে দিয়ে। বনোয়ারীলাল ঘোর সাত্ত্বিক শাকাহারী। করিমের দোকান থেকে কাগজে মোড়া কাবাবের প্যাকেট হাতে করে আনাটাই রীতিমত অনাচার তার কাছে। বারান্দার কলে বারংবার হাত ধুয়ে তবেই রান্নাঘরে ঢুকেছে সে।

চায়ের কাপে চুমুক লাগিয়ে বিমল প্রশ্ন করলো, "তারপর কি হল কিশোরীদা? জন্মান্তরের কথা বলছিলেন।"

কিশোরীদা হালকা গলায় বললেন, "ওই তো, ওটাই জন্মান্তর। তারক মামাদের অবস্থা ফিরে গেল। শুধু ভাল চাকরি পেয়ে ক্ষান্ত হলেন না। সেইসঙ্গে পড়াশোনা জারি রাখলেন। পরীক্ষা দিয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হলেন। আরও ভাল এবং তার থেকেও ভাল চাকরি পেয়ে গেলেন। নিজের পেশায় দারুণ নামডাক হল। উন্নতির তুঙ্গে উঠলেন ক্রমে।

"তারকমামা আমার মামা হলেও খুব একটা বয়োজ্যেষ্ঠ নন। আমার চেয়ে মাত্র বছর পাঁচেকের বড়। আমার বড়দার সমসাময়িক। প্রায়

সমবয়সী হলেও বিশেষ নিকটত্ব অনুভব করিনি ছোটবেলায়। আসলে আত্মীয়মহলে তারকমামার সুখ্যাতি শুনে শুনে তার প্রতি মনটা একটু বিরূপই হয়ে গিয়েছিল আমাদের। সেই ছোটবেলা থেকে, তারকমামা কত ভাল আর আমরা তার তুলনায় ধর্তব্যের মধ্যেই নই, গুরুজনদের কাছে একথাই শুনে এসেছি অবিরত। বড়দার তো একটা কমপ্লেক্সই হয়ে গেল শেষে। অথচ বড়দা মোটামুটি ভালই ছিল পড়াশোনায়। একই বছর ম্যাট্রিক দিয়েছিল বড়দা আর তারকমামা।

ফার্ষ্ট ডিভিসন পেয়ে লাফাচ্ছে যখন, তখন বাবা খবরের কাগজখানা বড়দার সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এই দ্যাখ্।'

মেরিট-লিষ্টে তারকমামার নাম। মুহূর্তে মিইয়ে গেল বড়দা।

"তারকমামার সঙ্গে পারিবারিক কাজকর্মেই সাধারণত দেখা হত। শান্ত, মিতভাষী। একটু বেচারা বেচারা টাইপের লাগতো তারকমামাকে, যদিও দেখতে দারুণ সুদর্শন ছিল। নিজের অসাধারণ মেধা ও সাফল্যের জন্য কোনরকম আত্মম্ভরিতার ছিটেফোঁটাও প্রকাশ পেতো না ওর ব্যবহারে। সবমিলিয়ে মানুষটাকে ভাল লাগারই কথা। কিন্তু বাড়িতে অহরহ তুলনামূলকভাবে তারকমামার গুণগান বড়ই দুঃসহ মনে হত আমাদের।

"তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম তারকমামা পড়াশুনা ছেড়ে চাকরিতে ঢুকেছে। এরপর শুনলাম তারকমামার বিয়ে। বিয়েতে মা একা গেলেন শুধু। বাবা ছুটি পেলেন না। আমাদের পরীক্ষা সামনে।

মা এসে বাবাকে বললেন, 'বীরেশ্বর দত্ত ধড়িবাজ লোক। আহা, ধুমসি মেয়েটাকে গছানোর জন্যেই তারকটাকে চাকরির টোপ গেলালো।'

এরপর দু'এক বছর তারকমামার স্তুতিগাথা থেকে অব্যাহতি পেলাম। কিন্তু বেশীদিন নয়। আবার যেমন যেমন তারকমামা চাকরি জীবনে উন্নতি করতে লাগলো সে সব খবর ফলাও করে আমাদের কানে ঝালানো হতে থাকলো জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণার দ্যোতক রূপে।

"আমি চাকরি নিয়ে স্থানান্তরে চলে এলাম। বাবা মা রয়ে গেলেন বড়দার সংসারে।

ছুটিতে গিয়ে শুনি মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাহুতাশ করছে, 'আহা পিসি আমার রত্নগর্ভা, কি ছেলেই পেটে ধরেছিল! সত্যযুগে রামচন্দ্র পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। এযুগে তারক শ্রীরামকেও মাত দিলো।'

বড় বউদি যমজ বাচ্চাদু'টোকে নিয়ে হিম্‌সিম্। বাবা-মা'র নাকি যত্নআত্তি হয়না।

মাকে আড়ালে একদিন বললাম, 'কেন মা সবসময় ওদের এত সুখ্যাতি করো? দাদা-বউদি তাদের সাধ্যমত তো করছেই! তুমিই তো বলেছিলে সবিতামামীমা মোটা ধুম্‌সি, ওর বাবা তারকমামাকে ভালমানুষ পেয়ে গছিয়ে দিয়েছে।'

মা আমার প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে একটু দমে গেল। তারপর জীভ কেটে দুহা'তে কান ছুঁয়ে বললো, 'তখন না জেনে বলেছি। সবিতা তো মেয়ে নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। পিসি বলে বউমাকে সোনা দিয়ে ওজন করলেও দাম উঠবে না।'

"এরপর বড়দা দুম্ করে একটা কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ একদিন একটা টিনের সুটকেস হাতে করে সস্তা মিলের শাড়িপরা একটি মহিলার আবির্ভাব হল। বড়দা জানাশোনা অনেককে বলে রেখেছিল বাবামা'র সেবাযত্নের জন্য একজন সারাদিনের লোকের খোঁজ দিতে। তাদেরই কেউ করুণাময়ীকে পাঠিয়েছে। ভদ্রঘরের সহায়সম্বলহীন দুখী মানুষ। মাথার উপর কেউ নেই। সবরকম কাজেকর্মে পটীয়সী। মাইনে, খোরাক, কাপড়চোপড়, তেলসাবান বাবদ বেশ বড় একটা খরচ চাপলো বড়দার ঘাড়ে। আমি তখন যা মাইনে পাই তাতে নিজেরই ঠিকমত সঙ্কুলান হয় না। বড়দাকে আর্থিক সাহায্য করার ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতা ছিল না।

একথা বলতে বড়দা আশ্বাস দিয়ে বললো, 'তুই ভাবিস্ না। কুলিয়ে নেবো। সুখের চেয়ে শান্তি ভালো। মা'র নিত্যকার এই গঞ্জনা আর ভাল লাগে না। তাছাড়া বাবামা'র বয়স হয়েছে। এই বয়সে ওদের সত্যিই একটু আরাম দরকার। তোর বউদি পেরে ওঠে না।'

"ফুলটাইম লোক রাখার সিদ্ধান্তটা বড়দা বেমক্কা রাগের মাথায় নিয়ে থাকলেও এজন্যে আফসোস করতে হয়নি তাকে। করুণাময়ী এসে সংসারের ভোল পাল্‌টে দিলো। যেন দশভূজা দশ হাতে সমানে কাজ

করে চলেছে। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। এবং মুখে কথা নেই। হ্যাঁ, ওই একটা দোষ ছিল করুণাময়ীর। কিছুতেই কথা বলতো না। সংক্ষিপ্ততম বাক্য বা শব্দ ছাড়া। তাও খুব প্রয়োজন পড়লে। এছাড়া সবসময় একটা কাঠ কাঠ নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে রাখতো মুখাবয়বে যাতে করে তাকে বেশ অসামাজিক মানুষ বলে মনে হ'ত। তবে এটুকু ঘাটতি নিয়ে পরে আর কেউ মাথা ঘামাতো না। কাজের ব্যাপারে কোথাও তার এতটুকু শিথিলতা কিংবা ত্রুটি ছিল না। কোনও কাজ করতে দ্বিধা বা আপত্তি করতো না। এর উপর ছিল দুর্দান্ত চট্‌পটে আর শরীরে ছিল অফুরন্ত কর্মশক্তি।

"এরপর ছুটিতে বড়দার ওখানে গিয়ে তাক লেগে গেল আমার। বউদির স্বাস্থ্য ফিরে গেছে। বাবা-মাকে এর আগে কোনদিন এমন খোশমেজাজে দেখিনি। দাদা অফিস থেকে ফিরে স্বস্তিতে জিরিয়ে কাগজ পড়ে, টিভি দেখে। নালিশ বায়নাক্কার ফিরিস্তি শুনতে হয় না আর। বাবা নাতনিদের কাছে ডেকে নিয়ে খেলা করেন। মা বউদির সঙ্গে হালকা গলায় গল্পগুজব করে হেসে হেসে। এইসব দেখে শুনে একদিন হঠাৎ আমার মাথায় এক দুষ্টুবুদ্ধি চাপলো। মাকে তারকমামার প্রসঙ্গটা ধরিয়ে দিলাম। তার জীবনের বাছা বাছা সাফল্যগুলোর উল্লেখ করলাম। মা কোন উৎসাহ দেখালো না।

বাবা মুখখানা গম্ভীর করে বললেন, 'গেলবার তারক অফিসের কাজে এসেছিল। আমাদের বাড়ি এলো আর চলে গেল। বললো হঠাৎ নাকি কি একটা জরুরী কাজ মনে পড়ে গেছে।'

মা তীক্ষ্ণকন্ঠে যোগ দিলো, 'বুঝলি কিশোরী, এসে সবে বসেছে। তোর বাবা আর আমি ওদের বাড়ির খোঁজ খবর নিচ্ছি। হঠাৎ ঝপ্ করে উঠে পড়ে বলে কিনা, চললাম। ভীষণ দরকার। তোর বউদি বেচারী কত যত্ন করে মালপুয়া বানিয়ে রেখেছিল তারকমামা আসবে বলে। তা তারক সে মালপুয়া দাঁতেও কাটলো না। চা জলখাবার সব যেমনকার তেমনি পড়ে রইলো। দুদ্দাড় উঠে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। তারকের এখন ভীষণ বড় চাকরি হয়েছে কিনা, অনেক বড়লোক। ব্যাভারখানাই পালটে গেছে টাকার গরমে ----।'

"গেল বছর কলকাতায় তারকমামার সঙ্গে দেখা হতে আমায় গাড়িতে বসিয়ে আমজাদিয়ায় নিয়ে গেল। আমার পছন্দসই একরাশ

খাবার অর্ডার দিয়ে আনালো। তখনই শুনলাম তারকমামার জীবনের ইতিবৃত্ত। এর আগেও আমায় এখানে ওখানে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে। হাজার হলেও ভাগ্নে হই, তার উপর চালচুলোহীন ব্যাচেলর। চাকরিটাও জুটেছে অতি মামুলি ধরনের। সব মিলিয়ে আমাকে ইদানীং বেশ অপত্যস্নেহেই দেখতো তারকমামা। তবে রেস্তরাঁয় বসে আত্মকথা বলা এই প্রথম। কারণটা পরে বুঝলাম। তারকমামাই বললো।

বললো, 'দ্যাখো কিশোরী, মানুষ নিজের অদৃষ্ট নিয়ে আসে - যদিও আমি একথা এখনও পুরোপুরি মানতে পারিনি। সে যাই হোক, অতীতকে নিয়ে জীবন কাটানো যায় না। টুনু আজ আমার কাছে চিরতরে বিলুপ্ত অতীত। ওর পথ আমার পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং আমি তা মেনে নিয়ে নিজের পথে এগিয়ে চলেছি। আজ হঠাৎ দু'জনে মুখোমুখি এসে পড়ে শুধু দুঃখই পাবো। আমাদের কারোই মঙ্গল হবে না তাতে ----। তাই সেদিন টুনুকে তোমাদের বাসায় ওই অবস্থায় দেখে কাজের দোহাই দিয়ে উঠে এলাম। এরপর আর ওখানে যাইনি। টুনু থাকতে ওখানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় ----।'

"একথা আমি বাড়িতে কাউকে বলিনি। বড়দাকেও না। মাকে তো নয়ই। জানি একথা শুনলে তারকমামার প্রতি মা'র ভুল ধারণা চলে যাবে। মা বুঝতে পারবে এখনও আগের মতই ভদ্র ভাল আর সুবিনীত রয়ে গেছে তারকমামা। বুঝতে পারবে যে তারকমামার সেদিনকার সেই অদ্ভুত আচরণের পিছনে ছিল প্রচণ্ড দুঃসহ অসহায়তা, টাকার গরম নয়। কিন্তু টুনুই যে করুণাময়ী এ কথা প্রকাশ পেলে করুণাময়ীর হয়তো ওখানে আর স্থান হবে না। বড়দার সংসার থেকে এই নবলব্ধ শান্তি, স্বস্তি, আয়েস বুদ্‌বুদের মত এক ফুৎকারে মিলিয়ে যাবে। আমি কিছুতেই ওদের সেই দুর্দশার কারণ হতে পারবো না।"